# অন্বীক্ষা

## আন্তর্জালিক পত্রিকা

২০২১-২০২২

## ইতিহাস বিভাগ

## হাজী এ .কে. খান কলেজ

স্বাধীনতার ৭৫ বছর : বিস্মৃতপ্রায় শহীদ

# সূচিপত্র


| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে | ০২ |
| সম্পাদকীয় | ০৩ |
| স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অগ্নিকন্যা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি | ০৪ |
| দুকড়িবালা দেবী : স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃতপ্রায় নারী | ০৬ |
| স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক পথিকৃৎ বটুকেশর দত্ত | ০৭ |
| মানভূম জননী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ | ০৮ |
| বিস্মৃতির অন্তরালে অন্তরিত মহিলা বিপ্লবী সুহাসিনী গাঙ্গুলি | ০৯ |
| স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আবুল কালাম আজাদ | ১০ |
| তেভাগা আন্দোলন এবং রাসমনী | ১১ |
| হেমু কালানী: ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয় বিপ্লবী শহীদ | ১৩ |
| বীর বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিল | ১৪ |
| প্রফুল্ল চাকী : ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী | ১৫ |
| ননীবালা দেবী : বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দী | ১৭ |
| বীরাঙ্গনা ঝলকারী বাঈ | ১৯ |
| স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী বাসন্তী দেবী | ২০ |

# অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে

বিগত দেড় বছর ধরে অতিমারীর করালগ্রাস থেকে নিজেদের রক্ষার তাগিদে আমরা ঘরবন্দী থেকেছি। দীর্ঘসময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুয়ার ছিল বন্ধ। ধুলো জমেছিল বেঞ্চ ও টেবিলে। আজ সেই ধুলোর পড়ত সরতে শুরু করেছে। ছাত্রছাত্রীদের আগমনে শিক্ষাঙ্গন হয়েছে কল্লোলিত। লকডাউনে গৃহবন্দী ছাত্রছাত্রীদের মানসিক অস্থিরতা দূর করে তাদের সৃজনশীলতার বিকাশের উদ্দেশ্যে অন্বীক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই বছরও ইতিহাস বিভাগ যথাসময়ে আন্তর্জালিক পত্রিকাটি প্রকাশ করতে চলেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে সম্পাদকমণ্ডলী পত্রিকাটির যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছে তা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক। এই পত্রিকা আগামীদিনের ইতিহাসচর্চাকারীদের আঁতুরঘর। ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিতব্য পত্রিকাটি সর্বৈব সেই উদ্দেশ্য পালনে সফল হবে- এই কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

ডঃ গৌতম কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ
হাজী এ. কে. খান কলেজ

# সম্পাদকীয়

অন্বীক্ষার পথচলা শুরু হয়েছিল গতবছর মহামারী পরিস্থিতিতে। ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনাকে নতুন করে জানার অনুসন্ধিৎসা তৈরি করা। মূলতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই ২০২০ সালে অন্বীক্ষার প্রথম প্রকাশ। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের লেখার দক্ষতা ও উপস্থাপন ক্ষমতাকে প্রস্তুত করে দেওয়ার একটি প্রাথমিক প্ল্যাটফর্ম দিতে চেয়েছিল এই আন্তর্জালিক পত্রিকা। বর্তমানে প্রযুক্তির প্রকোপে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মননশীল চর্চা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। সেই স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে তাদের মনে অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তোলাই অন্বীক্ষার মূল উদ্দেশ্য । এবছর আমাদের বিভাগীয় পত্রিকা স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে বিস্মৃতপ্রায় শহীদদের সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টায় রত হয়েছে। ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল্মুক্ত করার জন্য যাঁরা দেশমাতৃকার মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন, যাঁদের পবিত্র রক্তধারায় ভারতবর্ষের ললাটে অঙ্কিত হয়েছিল স্বাধীনতার বিজয়তিলক তাঁরা চিরস্মরণীয়। কিন্তু এঁদের অনেকের নাম কেউ জানে না, কোনদিন তাঁদের নাম ওঠেনি কোন খবরের কাগজে। 'যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই – যারা বঞ্চিত' ইতিহাসের পাতায়, যারা বিস্মৃত অথবা বিস্মৃতপ্রায় ভবিষ্যতের চর্চায়, তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা। হয়তো পত্রিকাটিতে অনেক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি রয়ে গেছে। আশা রাখি পাঠকগণ নিজগুণে এই ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন । লেখাগুলি পাঠকমনে খ্যাত, অখ্যাত, কৃতীমান, অবজ্ঞাত, দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে কিছুটা অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে পারলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুপ্রেরণা, প্রত্যেক শিক্ষক- শিক্ষিকার সুচিন্তিত মতামত, বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও ছাত্রছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকাটি সুসজ্জিত হয়েছে। এই ঋণ অপরিশোধ্য। তবুও সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আশা রাখি পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ হবে।

পিয়ালী দাঁ , অনিকেত সরকার
পত্রিকা সম্পাদক
ইতিহাস বিভাগ
হাজী এ কে খান কলেজ

# স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অগ্নিকন্যা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি

**মুসলিমা খাতুন**

**দ্বিতীয় সেমিস্টার**

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি (২৫ জানুয়ারি ১৮৮৯, ২২ শে নভেম্বর ১৯৪৫) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিকন্যা।

জ্যোতির্ময়ী ১৮৮৯ সালে জানুয়ারি মাসে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রসিদ্ধ সমাজ সেবক দেশপ্রেমী এবং মাতা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা স্নাতক, ডাক্তার, সমাজসেবিকা। পিতা-মাতার নিকটবর্তী থেকেই জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি পেয়েছিলেন জীবনের সকল শিক্ষা ও প্রেরণা। তাদের মতোই সাহস ও আত্মবিশ্বাস তার ব্যক্তিত্ব ,তেমনি ছিল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ।

বাঙালি নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্যোতির্ময়ী দেবীর অবদান লক্ষণীয়। এম.এ. পাস করার পর কটকের রেভেলস গার্লস কলেজ, বেথুন স্কুল, কলম্বো দের বুদ্ধিষ্ঠ গার্লস কলেজ কলকাতা ব্রহ্ম স্কুলে অধ্যক্ষ রূপে স্ত্রী শিক্ষা প্রচার ব্রতী হন। লালা লাজপত রায়ের এর আমন্ত্রণে যোগ দেন জল বন্ধুর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে। নারীদের রাজনীতিতে ও দেশ সেবার আদর্শের উদ্‌বুদ্ধ করতে তিনি নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর গঠন করেছিলেন। তিনি অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' সংগঠনে ও সক্রিয়তা ভাবে যোগদান করেন। নারী মুক্তি,বিধবা বিবাহ এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানের অন্যতম সমর্থন ছিলেন তিনি। প্রবাসী,মর্ডান রিভিউ ইত্যাদি পত্রিকার রাজনৈতিক আদর্শ ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখেছেন।মেদনীপুরের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট পেরির তীব্র নিন্দা করে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় 'Another Crucitixion' নামে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখেন। বর্ণভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা জাতীয় সামাজিক কুপ্রথা তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি। নারী কল্যাণ সংগঠনময়ী বিদ্যা শিল্পাশ্রম,পুরি বসন্তকুমারী বৃদ্ধাশ্রম ইত্যাদির সাথেও যুক্ত ছিলেন। সমাজসেবার অভিপ্রায়ে ১৯২৬ সালের তিনি একটি ছাত্র সংস্থা গঠন করেন ।

পিতা-মাতার স্বদেশপ্রেমে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি নারী স্বেচ্ছা বাহিনী গঠন করেছিলেন। তখন নারীরা প্রকাশ্য রাজনীতি যেন করতে পারে, সেই জন্য তিনি মেয়েদের সাথে আলোচনা করতেন ও দলে যুক্ত করতেন। ১৯৩০ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুক্তির সংগ্রামে যুক্ত হন। এর জন্য তিনি কাজ গড়ে তুলেছেন শহরে ও গ্রামে। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। উর্মিলা দেবীর

নেতৃত্বে গঠিত নারী সত্যগ্রহ সমিতির সভা নেত্রী ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ২১ শে নভেম্বর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'এর এক মোকদ্দমার সময় কলকাতার ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে বন্দিদের মুক্তির জন্য শোভাযাত্রা করেছিলেন। তারা প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিলেন তখন সেটা ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। পুলিশ আটকে রাখল তাদের ধর্মতলায়। ছাত্ররা এগিয়ে যেতে পুলিশ গুলি ছুড়তে লাগলো। ছাত্ররা পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেন। আহত এর সংখ্যা ছিল অনেক তাদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। নিহত হয় কিশোর ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিগুণ ছাত্র এসে যোগ দিলেন ধর্মতলায় ছাত্রদের সঙ্গে তাদের সংকল্প দেখে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট আরও গুলি বর্ষিত করল আরো রক্ত ছাত্রদের বুক থেকে বয়ে গেল। অনেক রক্তের বিনিময় বিজয়ী হয় ছাত্ররা। সেদিন ডালহৌসী পরে স্বীকার করেছিলেন যে ছাত্রদের সামনে ব্রিটিশ গভর্নর কে মাথা নত করতে হয়েছিল। এই দ্বিতীয় দিনেই ২২শে নভেম্বর জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ও ছাত্ররা রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন মিলিটারি ট্রাক এসে তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার কয়েক ঘন্টার পরেই জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয়। এই দরদী নারীর মৃত্যু ছাত্র-আন্দোলনে তার ভূমিকা গৌরবময় পরিনতি।

**“Freedom of mind is the real freedom. A person whose mind is not free though he may not be in chains, is a slave, not a free man. One whose mind is not free, though he may not be in prison, is a prisoner and not a free man. One whose mind is not free though alive, is no better than dead. Freedom of mind is the proof of one’s existence.”**

**Bhimrao Ramji Ambedkar**

# দুকড়িবালা দেবী : স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃতপ্রায় নারী

**নাইস পারভিন খাতুন**
**দ্বিতীয় সেমিস্টার**

দুকড়িবালা দেবী ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নারী বিপ্লবী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২১ জুলাই ১৮৮৭ সালে বীরভূম জেলার নলহাটি থানার, ঝাউপাড়া গ্রামে। পিতা ছিলেন নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং মা কমল কামিনী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাড়া গ্রামেরই ফণীভূষণ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম দিকের নারী বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তিনি সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দুকড়িবালা দেবী ছিলেন ব্রিটিশ শাসক দ্বারা প্রথম সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত নারী।

দুকড়িবালার বোনপোর নাম ছিল নিবারণ ঘটক। মাসিমা দুকড়িবালা দেবী নিবারণ ঘটককে খুব স্নেহ করতেন । বোনপো প্রায় ই তার বাড়িতে বন্ধুদের নিয়ে আসতেন। স্বদেশী বই বা বেআইনি বই লুকিয়ে পড়ার স্থান ছিল মাসিমার বাড়ি। এইসব দেখে দুকড়িবালা দেবীর কেমন সন্দেহ হতো। তিনি সকলের আড়ালে বইগুলি দেখেন এবং পড়েন। নিবারণ ঘটকের প্রভাবে দুকড়িবালা দেবী দেশের কাজে এগিয়ে আসেন। বিপ্লবীদের দলে তিনি মাসিমা নামে পরিচিত ছিলেন।একদিন বোনপো নিবারণ সাতটা মাউজার পিস্তল এনে লুকিয়ে রাখতে দিলেন মাসিমা দুকড়িবালা দেবীকে। এগুলি ছিল রড়া কোম্পানি থেকে চুরি করে আনা অস্ত্র। ১৯১৪ সালে ২৬ শে আগস্ট রড়া কোম্পানির জেঠী সরকার শ্রীশ মিত্র বড় সাহেবের হুকুম মতো মাল খালাস করতে জাহাজ-ঘাটে যান। তিনি ২০২টি অস্ত্রপূর্ণ বাক্স খালাস করে সাতটি গুরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসতে থাকেন। ৬ খানা গাড়ি তিন রডা কোম্পানির গুদামে পৌঁছে দেন। একটি গাড়ির গারোয়ানের ছদ্মবেশে বিপ্লবী হরিদাস দত্ত গাড়িটিকে নিয়ে উধাও হন। সেই গাড়িতে ৯ বাক্সে ছিল কার্টিজ এবং একটিতে ৫০টি মাউজার পিস্তল। মালগুলি পরে বিপ্লবীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত। নিবারণ ঘটক কে দেওয়া সাতখানি মাউজার পিস্তল ও কার্টিজ নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রাখেন দুকড়িবালা দেবী।এরপর পুলিশ খবর পেয়ে ৮ জানুয়ারি ১৯১৭ সালে দুকড়িবালা দেবীর বাড়ি ঘিরে ফেলেন। তল্লাশিতে পাওয়া যায় সাতটা মাউজার পিস্তল। শত জেরাতেও মাসীমার মুখ থেকে বের করতে পারল না যে, কে দিয়েছিল তাকে পিস্তল গুলি। দুকড়িবালা দেবী কোলের শিশুকে বাড়িতে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। বিচারের রায়ে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এমনই ছিলেন তখনকার দিনের অগ্রগামী নারী সৈনিকরা।

# স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক পথিকৃৎ বটুকেশর দত্ত

## মৌলি সরকার

## ষষ্ঠ সেমিস্টার

1929 সালের 8ই এপ্রিল, দিল্লির কেন্দ্রীয় বিধানসভা, 19 বছর বয়সী যে বালকের কণ্ঠে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" (বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক) স্লোগানে কেঁপে ওঠে তিনি শহীদ ভগৎ সিংয়ের নির্ভীক সহচর বটুকেশ্বর দত্ত। 1910 সালের 18 নভেম্বর তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে বটুকেশ্বর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি থিওসফিক্যাল হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং কানপুরের পৃথ্বীনাথ কলেজ থেকে স্নাতক হন। কলেজের দিনগুলিতে, তিনি শহীদ ভগৎ সিংয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেন। সময়ের সাথে সাথে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন।

বাকস্বাধীনতা, নাগরিক স্বাধীনতা এবং শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে দমনমূলক বিলের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে। তাদের নিজের ভাষায় "বধির শুনতে হলে শব্দ খুব জোরে হতে হবে। বটুকেশ্বর দত্ত, ভগৎ সিং সহ, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বিধানসভার ফাঁকা জায়গায় দুটি হাতে তৈরি বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। তারা “ইনকিলাব জিন্দাবাদ” স্লোগান দেয় এবং দর্শক গ্যালারি থেকে লিফলেট বর্ষণ করে। ভগৎ সিং ও বটুকেশর দত্তকে একই দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা পালানোর চেষ্টা করেনি । দত্ত কারাগারেও মানবাধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যান। তিনি বন্দীদের জন্য উন্নত জীবনমানের দাবিকে সমর্থন করার জন্য 114 দিন ধরে চলা অনশন ধর্মঘটে ভগত সিং-এর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের দাবির মধ্যে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য একই খাদ্যতালিকা প্রদান, বই, পড়ার উপকরণ, অন্তত একটি মানসম্পন্ন দৈনিক সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। আন্দামানে, তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন এবং কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে অনশনে অংশ নিয়েছিলেন। পরে হাজারিবাগ জেল, দিল্লি জেল এবং পাটনা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

দত্ত 1938 সালে পাটনা জেল থেকে মুক্তি পান। তিনি যক্ষ্মা সহ বিভিন্ন রোগে ভুগেছিলেন। তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও, তিনি 1942 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গান্ধীজির সাথে যোগ দেন। তাঁকে আবার আরও চার বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী 1947 সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি পাটনায় চলে আসেন। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেন।

# মানভূম জননী লাবণ্য প্রভা ঘোষ

## পিয়ালি ঘোষ

## চতুর্থ সেমিস্টার

মানভূম জননী লাবণ্য প্রভা ঘোষ বাংলার একজন বিশিষ্ট নারী বিপ্লবী এবং ভারতের স্বাধীনতাঁর জন্য অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সাথে লড়াই করে তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন।

14 আগস্ট 1897 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঋষি নবারুণ চন্দ্র একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। যাইহোক, লাবণ্য কখনই স্কুলে যাননি, বাড়িতেই তাঁর বাবা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। মাত্র 11 বছর বয়সে তিনি অতুল চন্দ্র ঘোষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতুল চন্দ্র ঘোষ ছিলেন পুরুলিয়ার বাসিন্দা এবং ভারতের স্বাধীনতাঁর লড়াইয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব । 1921 সালে, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য তাঁর বাবাকে পুরুলিয়া জেলা সরকার আটক করে। তাঁর মুক্তির পর, ঋষি নবারুণ চন্দ্র এবং অতুল চন্দ্র ঘোষ পুরুলিয়ার তেলকালপাড়ায় একটি সংগঠন 'শিল্পশ্রম' তৈরি করেন। সেটি ঐ এলাকার ওবিপ্লবীদের এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্যদের কর্মকান্ডের কেন্দ্র হয়। সুভাষ চন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাস এবং মহাত্মা গান্ধীর মতো বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই স্থানে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে সভা পরিচালনা করেছিলেন। লাবণ্য প্রভা ঘোষ নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সংগঠনের কাজে জড়িয়ে পড়েন।

1926 সালে পুরুলিয়ার লোকেরা মানভূম জননী (মানভূমের মা) নামে পরিচিত, লাবণ্য ঘোষ মানভূম জেলা থেকে জেলা কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হন, যার মধ্যে সেই সময়ে পুরুলিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন পুরুলিয়ার লোক সেবক সংঘের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রথম মহিলা। এদিকে, গান্ধীজির 1930 সালের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলনের সমর্থনে লাবণ্য স্থানীয়ভাবে একই ধরনের মিছিল সংগঠিত করে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। 1941 সালে, তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ব্রিটিশদের দ্বারা গ্রেফতাঁর হন। তিনি 1945 সালে কোনপাড়ায় একটি পতাকা সত্যাগ্রহ (পতাকা সত্যাগ্রহ) সংগঠিত করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা একাধিকবার কারারুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি হাল ছাড়েননি।

লাবণ্যর বাবা ছিলেন একটি দ্বি-সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা মুক্তির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। 1925 সালে চালু এবং মানভূম দ্বারা প্রকাশিত, মুক্তি ছিল একটি প্রভাবশালী বিপ্লবী প্রকাশনা যা স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। লাবণ্যের কাজ 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সাথে থেমে থাকেনি। স্বাধীনতার পর, 1940 এবং 1950 এর দশকে, তিনি পূর্ববর্তী মানভূম জেলায় ভাষা আন্দোলনের (বাংলা ভাষা আন্দোলন) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিবাদের জন্য বিহার সরকার তাকে বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধ করেছে এবং এমনকি জরিমানাও করেছে। ভাষা আন্দোলনের ফলস্বরূপ, পুরুলিয়া মানভূম জেলা (বিহারে) থেকে বিভক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয়। 1969 সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে, তিনি এর সম্পাদক হন এবং শিল্পাশ্রমের কার্যভারও গ্রহণ করেন। লাবণ্য প্রভা ঘোষ জীবনের শেষ পর্যায় দুর্দশা এবং নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তিনি 11 এপ্রিল 2003 এ মারা যান।

# বিস্মৃতির অন্তরালে অন্তরিত মহিলা বিপ্লবী সুহাসিনী গাঙ্গুলী

মোতিউর রহমান
চতুর্থ সেমিস্টার

সুহাসিনী গাঙ্গুলী ছিলেন একজন বিপ্লবী যিনি তাঁর সমগ্র জীবন তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতাঁর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। 03 ফেব্রুয়ারী 1909 সালে অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায় অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং সরলা সুন্দরী দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

গাঙ্গুলি 1924 সালে ঢাকা ইডেন স্কুলে তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন সম্পন্ন করেন। ডিপ্লোমা করার পাশাপাশি, গাঙ্গুলী তাঁর পেশাগত জীবনও শুরু করেন। তিনি মূক ও বধিরদের জন্য একটি বিশেষ স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিতে কলকাতায় স্থানান্তরিত হন। কলকাতায় থাকাকালীন সুহাসিনী গাঙ্গুলী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কমলা দাস গুপ্তের সাথে পরিচিত হন এবং সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী যুগান্তর দলের সদস্য হন। যোগদানের পরপরই, সুহাসিনী নতুন সদস্যদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে সাহায্য করার মাধ্যমে একটি আধা-বিপ্লবী ছাত্র গোষ্ঠী ছাত্রী সংঘকেও তাঁর সময় উৎসর্গ করেন। ছাত্রী সংঘ এবং যুগান্তর গোষ্ঠীর সাথে তাঁর দৃঢ় বন্ধন তাকে সমমনা ব্যক্তিদের সাথে সংযুক্ত করেছিল যারা একই রকম সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্বাসের অধিকারী ছিল যা স্বাধীনতাঁর জন্য অটল আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল।

1930 সালের 18 এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের পর, ভারতীয় স্বাধীনতা বিপ্লবীরা পুলিশ এবং সহায়ক বাহিনীর অস্ত্রাগারে অভিযান চালানোর চেষ্টা করেছিল। সুহাসিনী গাঙ্গুলীর উপর এই বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়। যুগান্তর দলের সহযোগী সদস্য শশধর আচার্যের সহায়তায় এবং বিবাহিত দম্পতি হওয়ার ভান করে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেন। সেই বছরের সেপ্টেম্বরে, চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পুলিশ কর্মকর্তাদের একটি দল চন্দননগরে গাঙ্গুলীর বাড়িতে অভিযান চালায় ও সুহাসিনী দেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মুক্তির পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং গ্রুপের সাথে যুক্ত কাজে অংশ নিতে শুরু করেন। 1942 থেকে 1945 সালের মধ্যে তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হেমন্ত তরফদারকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য আবার কারারুদ্ধ হন। সুহাসিনী গাঙ্গুলী 23 মার্চ 1965 সালে একটি দুর্ভাগ্যজনক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

# স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আবুল কালাম আজাদ
## সালমান সোহেল মণ্ডল
## দ্বিতীয় সেমিস্টার

আবুল কালাম আজাদ ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১নভেম্বর ১৮১৮। আবুল কালাম আজাদ এর ডাক নাম ছিল আজাদ, এই নামে তিনি অধিক পরিচিত ছিল। তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী ও অকপট ছিলেন। তাকে বহু আন্দোলনে গান্ধী এর সাথে দেখা যায়।

আবুল কালাম আজাদ এর জন্ম হয় ১১নভেম্বর ১৮১৮। তার পিতা ছিলেন খায়েরউদ্দীন । তিনি ছিলেন চরম রাজনীতিবিদ। সাংবাদিক হিসেবে তিনি তার লেখায় রাজনৈতিক সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তার মধ্যে একটি কাব্যিক নিবন্ধ ছিল ইয়ারান-ই-আলম। এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা আল-মিসবাহ। মাত্র ১২ বয়স থেকে তিনি সম্পাদনের কাজ শুরু করেন । তরুণ বয়স থেকেই আবুল কালাম আজাদ উর্দু ভাষার কবিতা লিখতেন। তিনি ধর্ম ও শাস্ত্র নিয়ে নিবন্ধন শুরু করেন। তিনি পেশা ছিলেন একজন সাংবাদিক। আজাদ ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অহিংসা, অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়। ১৯২৩ সালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালে তিনি ধারসনা সত্যাগ্রহ তিনি নেতৃত্ব দেন। তার মধ্যে তখন ধর্মনিরপেক্ষতা ও অহিংসা সত্যাগ্রহী সমস্ত প্রতিভা ফুটে ওঠে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তিনি পাঁচ বছর কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।আবুল কালাম আজাদ তরুণ বয়সেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। ১৯৯২ সালে তাকে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন নামে ভূষিত করা হয়। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা বিস্তারে তার উজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে তার জন্ম দিনটিকে জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতেও যা আমাদের ত্যাগের দিকে , তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব , মানুষের ধর্ম। –

মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# তেভাগা আন্দোলন এবং রাসমনি

আইরিন পারভিন
দ্বিতীয় সেমিস্টার

তেভাগার শহীদ রাসমণি (মৃত্যু ১৯৪৬ সালের ৩১ শে জানুয়ারি) কিন্তু রাণী রাসমণি নন। তেভাগা আন্দোলনে ইলা মিত্রের যেমন অবদান রয়েছে তেমনি এই রাসমণি দেবীরও অবদান রয়েছে। ময়মন সিংহ এর বাগমারীর এক টঙ্ক চাষীর ঘরে জন্ম তাঁর। বারো বছর বয়সে টংক চাষীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরেই বিধবা হলে 'স্বামী খেয়েছে' বলে 'ডাইনী' নাম হয়েছিল তাঁর। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল সংগ্রামের জীবন। বাঁচতে হয়েছে অন্যের সাহায্য ছাড়া। একাকী জীবনে নিজে হাতে ধান বুনে, ধানকেটে, চাল তৈরি করে, হাটে বেচে দিনপাত করতেন। গরম কালে কাঠ কুড়িয়ে, বিক্রি করে, শীত কালের খাবার জোগার করে রাখতেন। হাতে তাঁত বুনতেন, ধাত্রী মায়ের কাজ করতেন দক্ষহাতে। লতাপাতার গুনাগুন জেনে অসুখ সারাতেন গ্রামবাসীর। নিজে হাতে তাঁতবুনে কাপড় দিতেন গরিব হাজং মেয়েদের। ধীরে ধীরে হাজঙ্গ, ডালু, গারোদের প্রিয় হয়ে উঠলেন রাসমণি। হতদরিদ্র ঠিকা চাষীরা তখন জমিদারদের অত্যাচারে নিপীড়িত। অর্থ আর পরিশ্রম দিয়ে ফলানো ফসল বেশির ভাগ তুলে দিতে হত জমিদার বা জোতদারকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে চলছে এক ভয়ংকর যুদ্ধ, চলছে ব্যাপক ওলটপালট। যুদ্ধ-সৃষ্ট মন্বন্তরে বিপর্যস্ত গ্রামজীবন, হাজং অঞ্চলে সেই দুর্ভিক্ষ রোখার জন্য 'বেশি খাদ্য ফলাও', 'খাল কাটা', ' বাঁধ বাঁধা' ইত্যাদি আন্দোলন গড়ে ওঠে। আর সেইসব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন রাসমণি। তাঁর নেতৃত্বে গামে গড়ে ওঠে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যখন কিছু স্বার্থান্বেষী মুনাফালোভী মানুষ উৎপাদিত দ্রব্য নিজ খামারে মজুত করে রেখে শুরু করেছিল কালোবাজারি, ঠিক তখনই তিনটি গ্রামের অন্নের দায়িত্ব নিয়ে লঙ্গরখানা খুলেছিলেন রাসমণি। এবং তার জন্যে শুধুমাত্র দরজায় দরজায় গিয়ে চাল সংগ্রহ নয়, কালোবাজারি চোরা ব্যবসায়ীদের মজুতখানা থেকে রাসমণির নেতৃত্বে বাজেয়াপ্ত করা হতো চাষীদের হকের চাল।

চাষীদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে জমিদারেরা চিরকালই নিজেদের ইচ্ছামত তাদের ঠকিয়েছে। তাই প্রয়োজন শিক্ষার। যাতে অশিক্ষার কারণে হাজং চাষীদের আর সর্বস্বান্ত হতে না হয় তার জন্য সেই অঞ্চলে রাসমনির আবেদনেই শুরু হয় এক নৈশ বয়স্ক বিদ্যালয় এবং স্বয়ং তিনিই ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। কালক্রমে এই স্কুলই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক শিক্ষার

পীঠস্থান। বর্ণপরিচয় হাতেখড়ির সঙ্গে চলতে থাকে রাজনৈতিক আলোচনাও। এমনভাবেই রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন ও অভিজ্ঞতার গল্প শোনার মধ্যে দিয়েই সেদিনকার বাল্যবিধবা রাসমণি গড়ে তোলে এক বিপ্লবী দল। তিনি গ্রহণ করেন ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলের আন্দোলনের নেতৃত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলার বুকে দানা বাঁধতে থাকে তেভাগা আন্দোলনের বীজ। টঙ্ক আন্দোলনের পর ময়মনসিংহে তেভাগা আন্দোলন আরও তীব্র আকার নেয়। সারা জেলায় তেভাগার লড়াই শুরু হয়ে যায়। 'আধি নয় তেভাগা চাই', 'ফসল কেটে ঘরে তোল', 'দখল রেখে চাষ কর', 'টঙ্ক প্রথার উচ্ছেদ চাই', 'জান দেব তবু ধান দেব না', 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই' – ইত্যাদি স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ায় নারীবাহিনী। গোলাম কুদ্দুস তাঁর 'লাখে না মিলায়ে এক'-এ বলেছেন, "গ্রামের সে ভয়ানক দিনগুলির মধ্যে যে না থেকেছে সে কি করে বুঝবে কৃষক মেয়েদের মনের ভাব, যখন তারা ধানের আটির উপর হাত বুলিয়ে বলে,- মা লক্ষী ঘরে এয়েচ ? তোমাকে আমি ছাড়বো না।– ' জান দেব তো ধান দেব না' র রহস্য এই।" ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চলে ও অন্যান্য স্থানে আন্দোলনরত চাষীদের শক্তি জুগিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রাসমণি। শুধুমাত্র চাষীদের নয় গ্রামে গ্রামে তিনি উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন চাষির ঘরের মেয়েদেরও। হাজং বিদ্রোহের ফলে সুসঙ্গ অঞ্চলের জমিদারির তিনটি মহকুমায় জমিদারের' রাজত্ব যখন প্রায় তলানিতে ঠেকেছিল, তখন ১৯৪৬ সালে ব্যাস্টিন সাহেবের পরিচালনায় 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনী' হাজং অঞ্চলের উপর আক্রমণ করে নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে। ভয়ংকর ধ্বংসলীলার পরেও হাজং চাষিরা পিছু হটেনি। এই রাসমণির নেতৃত্বেই সেদিন চাষী ও চাষী বউরা দা তীর-ধনুক নিয়ে বন্ধুকে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই এই রণংদেহি শেখালেন নতুন যুদ্ধ মন্ত্র, শেখালেন ঐক্যের শক্তি। লড়াই তখন মধ্যগগনে। দিনটা ছিল ১৯৪৬ এর ৩১ শে জানুয়ারি। বহেরাতলি গ্রাম কেঁপে উঠেছিল এক লাঞ্ছিত কৃষক-বধূ সরস্বতীর আর্তনাদে। ২৫ জন সৈন্য হাজং অঞ্চলের বহেরাতলি গ্রামে ঢুকে চালিয়েছিল লুটতরাজ। রাসমণি ও তার অনুগামীরা সে সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সরস্বতীর আর্তনাদ এসে পৌঁছলে ৩৫ জন বীরকে নিয়ে রাসমণি ছুটে যান বহেরাতলি গ্রামে। তীর-ধনুক, দা হাতে লড়াই চলে প্রতিপক্ষ রাইফেলধারী ২৫ জন সৈন্যদের বিরুদ্ধে। চলতে থাকে পাল্টা গুলিবর্ষণ। অন্তত দশটা বুলেটের ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাসমণির লাশ। বেঁচে থাকার অধিকার, নারীর সম্মান রক্ষার অধিকারের লড়াইএ সোমেশ্বরী নদীর জল সেদিন লাল হয়েছিল।

# হেমু কালানী: ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয় বিপ্লবী, শহীদ

রোজাইল ইসলাম
দ্বিতীয় সেমিস্টার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হেমু কালানী ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ। তার পিতার নাম ছিল ডাক্তার পেসমূল কালানি। হিমু কালানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৩ শে মার্চ 1923 সালে। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকারী ও শহীদ। তিনি ছিলেন পেশায় একজন রাজনীতিবিদ। তার মৃত্যু হয় ২১ জানুয়ারি ১৯৪৩ সালে। হেমু কালানীর আসল নাম ছিল রাহি হেমন, যদিও তাকে সকলেই হেমু বলে ডাকতেন। তার জন্ম হয়েছিল শুক্কুরে (অধুনা পাকিস্তান)। তিনি মূলত ছাত্র অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেন। শুক্কুরের তিলক হাইস্কুলে পড়াশোনা করতেন। সারা ভারত ছাত্র সংঘের শাখা স্বরাজ সেনার প্রধান ছিলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন হেমু। সিন্ধু প্রদেশে এই আন্দোলন প্রবল সারা ফেলে। এর তীব্রতায় আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ইউরোপিয়ান সেনাবাহিনীর বিশেষ একটি দলকে পাঠায় তা দমন করতে। হেমু কালানি ও তার সাথীরা এই পরিকল্পনা বানচাল করতে ট্রেন লাইন আটকানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে অক্টোবর রাতে তারা রেলের ডিসপ্লে খোলার জন্য আসেন। তাদের সঙ্গে যদিও ফিসপ্লেট খোলার যন্ত্র ছিল না। এই সময় দুর্ভাগ্যবশত হেমু ধরা পড়েন, তার সাথীরা পলায়নে সক্ষম হয় কিন্তু পুলিশ তাকে লকআপে ২২ দিন ধরে নির্মম অত্যাচার করলেও তার সহযোগীদের সম্পর্কে তিনি কোন তথ্যই বের করেননি।

বিচারে হেমুর ফাঁসির হুকুম হলে তদানীন্তন ভাইসরের কাছে তা মুকুবের আবেদন করা হয়। সিন্ধু প্রদেশের হাজার হাজার মানুষ তার জন্য mercy pitition -এ সই করেন। কিন্তু হিমু তার সহযোগী বিপ্লবীদের নাম জানাবেন এই শর্তে হাসিমুখ হবে শুনে সেই প্রস্তাব ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করেন। শুক্কুর সেন্ট্রাল জেলে ২১ জানুয়ারি ১৯৪৩ সালে মাত্র 19 বছর বয়সে তাকে ফাঁসিতে ঝুলে দেওয়া হয়। দেশ বিভাগের পর তার পরিবার পাকিস্তান হতে ভারতে চলে আসেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিপ্লবী হেমু কালানির মাকে ভাতা ও সম্মাননা প্রদান করেছেন। গুজরাট রাজ্যে তার স্মৃতিতে একাধিক রাস্তা, পার্ক, মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্তমানে তার নামে একটি কাশিম পার্ক বা লুকাস পার্ক বিরাজমান আছে।

# বীর বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিল

**Mst Ayesha Siddika**
**দ্বিতীয় সেমিস্টার**

রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম প্রাণপুরুষ। রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। শহীদ ভগত সিং তাকে এই বলে প্রশংসা করেছেন যে তিনি উর্দু ও হিন্দিতে একজন মহান কবি ও লেখক ছিলেন, যিনি ইংরেজি থেকে ক্যাথরিন এবং বাংলা থেকে বলসিভিক কি কাতুত অনুবাদ করেছিলেন। রামপ্রসাদ বিসমিল এর জন্ম হয়েছিল ১১ জুন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশ সাহু শাহজাহানপুর জেলায়।

১১ বছরের বিপ্লবী জীবনে রামপ্রসাদ অনেক বই লিখেছিলেন এবং তা তিনি স্বয়ং প্রকাশিত করেন। রামপ্রসাদের জীবনকালে প্রায় সমস্ত বই প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইংরেজ সরকার তার সমস্ত বই নিষিদ্ধ করে দেন। তার পিতার নাম ছিল মুরলীধর ও মার নাম মূলমতি দেবী। রামপ্রসাদ বিসমিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য মাত্র ৩০ বছর বয়সে ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হন ।তার বিখ্যাত রনহুংকার("সারফারোশি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হে দেখ না হে জোর কিতনা বাজো হে কাতিল মে হে ") এই গান গেয়ে কত বিপ্লবী যে ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হলেন তা জানা নেই।বিস মিল আজিমা বাদী রচিত স্যার ফারসি কি তামান্না গজলটি রামপ্রসাদ বিসমিলের মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে রনহুঙ্কার হিসাবে জনপ্রিয়তা পায়। রামপ্রসাদ বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের সদস্য হন। তাদের এই বিপ্লবের কাজে অর্থ সংগ্রহ করার দরকার অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্য। তিনি একদিন শাহজাহানপুর থেকে নকলতে ট্রেন ভ্রমণের সময় খেয়াল করলেন যে প্রত্যেক স্টেশন মাস্টার তার কেবিনে গার্ডের মাধ্যমে টাকার ব্যাগ আনছেন।

বিপ্লবীরা তাদের কাজকর্ম চালানোর জন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র কেনার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা ৮ আগস্ট ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানপুরে একটি সভায় বসেন। অনেক কথাবার্তার পর একটি সিদ্ধান্ত হয় যে তারা স্মরণপুর লখনৌ চলাচলকারী ৮ ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন বহনকারী সরকারের কোষাগার লুট করবেন। ৯ আগস্ট ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আশফাকুল্লা খান এবং অন্য একজন বিশ মিলে নেতৃত্বে ট্রেন রুট করেন। অন্যরা হলেন বাংলা থেকে রাজেন্দ্র লাহিদি এবং শচীন্দ্রনাথ বকশী, উন্নাও থেকে চন্দ্রশেখর আজাদ ,কলকাতা থেকে কেশব চক্রবর্তী, রায়বেরেলি থেকে বনওয়ারী লাল, বেনারস থেকে মন্নত নাথ গুপ্ত এবং সহজাহানপুর থেকে মুরালি লাল।

১৯২৬ সালে কাকোরি বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং এটির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে।এই মামলার বিচারে পন্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ঠাকুর রওশান সিং ,আশফাকুল্লা খানের ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়।যার ফলস্বরূপ ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে গোরখপুর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

# প্রফুল্ল চাকী : ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী

**Mst Asima Khatun**
**দ্বিতীয় সেমিস্টার**

প্রফুল্ল চাকী ছিলেন একজন ভারতীয় বিপ্লবী। যিনি ভারতের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার প্রয়াসে ব্রিটিশ উপনিবেশিক বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরাম বোস জেলা জজ মিনিস্টার ডগলাস কিংসফোর্ড কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন যে গাড়িতে কিংসফোর্ডের যাতায়াতের কথা ছিল সেখানে বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু তিনি সেই গাড়িতে ছিলেন না এবং দুই ব্রিটিশ মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল । প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেন যখন তাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে যাচ্ছিল। ক্ষুদিরাম কে গ্রেফতার করা হয় এবং দুই মহিলাকে হত্যার বিচার করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী এই ঘটনার নিন্দা করেন এবং দুই নারীর মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন যে " এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ তাদের স্বাধীনতা অর্জন করবে না" যাই হোক, বালগঙ্গাধর তিলক তার কেশরী পত্রিকায় দুই যুবককে রক্ষা করেন এবং অবিলম্বে স্বরাজের আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদোঁহের অভিযোগে ব্রিটিশ ও উপনিবেশিক সরকার তিলক কে অবিলম্বে গ্রেফতার করে।

প্রফুল্ল চাকী ১৮৮৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার একটি গ্রামে বিহারে একটি সচ্ছল জোতদার পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির একটি অংশ। তার পিতার নাম রাজনারায়ণ চাকী এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। রাজনারায়ণের পূর্বপুরুষ প্রাণকৃষ্ণ চাকি পাবনার চাচকিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তাদের আদি উপাধি ছিল বসু কিন্তু চাচকিয়াই বসবাসকারী লোকজনকে চাকিও বলা হত। তিনি তার পরিবারের পঞ্চম সন্তান ছিলেন। রাজনারায়ণ নগর স্টেট এর একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি বগুড়ার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নমুজা জনদা প্রাসাদ ইংলিশ স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি তার বড় ভাই প্রতাপ চন্দ্র চাকীর সাথে রংপুরে আসেন যার শশুর ছিলেন রংপুরের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। ইস্টবেঙ্গল আইন লঙ্ঘনকারি ছাত্রদের বিক্ষোভে অংশ নেয়ার জন্য তাকে নবম শ্রেণীতে রংপুর জেলা স্কুল থেকে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। এরপর তিনি রংপুরে ন্যাশনাল স্কুলে যোগ দেন যেখানে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী দর্শনের একজন বিশ্বাসী অনুশীলনকারী হয়ে ওঠেন।

বারিন ঘোষ প্রফুল্লকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং তিনি যুগান্তর দলে তালিকাভুক্ত হন। তার প্রথম দায়িত্ব ছিল পূর্ব বাংলা ও আসামের নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার

জোসেফ বাম্পফিল্ড ফুলারকে হত্যা করা তবে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর বিহারের মুজাফফরপুর এর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড কে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম বোসের সাথে প্রফুল্ল কে বেছে নেওয়া হয়। কিংসফোর্ড কলকাতায় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তার আগের মেয়াদে বাংলা তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের কঠোর ও নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়ার জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি এই ধরনের কর্মীদের শারীরিক শাস্তি দেওয়ার জন্যও উল্লেখ করেছিলেন। এর ফলে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয় এবং চাকি এবং বোসকে এই কাজটি সম্পাদনার জন্য মুজাফফরপুরে পাঠানো হয়। এই অপারেশনে প্রফুল্ল ভুয়া নাম নেন দীনেশচন্দ্র রায়।

ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল কিংসফোর্ডের স্বাভাবিক গতিবিধি দেখেছিলেন এবং তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় দুজনে কিংসফোর্ডের গাড়ি আসার জন্য ইউরোপীয় ক্লাবের গেটের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। গেট থেকে একটি গাড়ি বের হলে গাড়িতে বোমা ছোড়া হয়। তাদের দ্বারা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে একটি ভুল ছিল, কারণ গাড়িটি স্থানীয় কংগ্রেসম্যানের কন্যা এবং স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছিল। বোমার আঘাতে দুজন নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পালানোর জন্য আলাদা পথ নিলেন। নন্দলাল ব্যানার্জি, একই বগিতে ভ্রমণকারী একজন পুলিশ অফিসার প্রফুল্ল কে সন্দেহ করে এবং মোকামা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে কিন্তু প্রফুল্ল নিজের রিভলবার দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। তার শরীর থেকে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ক্ষুদিরামের দ্বারা সনাক্ত করার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়, যিনি দুর্ভাগ্যবশত বন্দী হন।

**"Take Risks in Your Life If You Win, U Can Lead! If You Lose, You can Guide!" ~ Swami Vivekananda**

# ননীবালা দেবী : বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দী

**আশিকুল আনসারি**

**দ্বিতীয় সেমিস্টার**

বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দী ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালিতে। পিতার নাম সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মা গিরিবালা দেবী। সেই সময়ের সামাজিক রীতি মেনে মাত্র এগার বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় তাঁর স্বামী মারা যান। এরপর তিনি তাঁর বাবার কাছেই ফিরে আসেন।

১৯১৪ সালে  প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা জার্মানির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেছিলেন।  যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) বালেশ্বরের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর যাদুগোপাল মুখার্জীর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা পূর্ব-ভারতের পথ ধরে চীন ও আসামের মধ্য দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আনিয়ে ভারতে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য বিপ্লবীরা আবার চেষ্টা করেছিলেন। এইরকম সময়ে তাঁর ভাইয়ের ছেলে বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন বাল্যবিধবা ননীবালা দেবী। দেশকে ভালোবেসে বিপ্লবীদের হয়ে তিনি নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতেন ও নিপুণ দক্ষতায় সে কাজ সম্পন্ন করতেন। তিনি বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য। তিনি বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, এক জায়গার নেতাদের নির্দেশ ও নানা দরকারী খবর অন্য জায়গার বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র গোপনে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতেন।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-জার্মান যোগাযোগ এবং তার পরের পর বিভিন্ন ঘটনার খবর পেয়ে, সেই সম্পর্কে পুলিস কলকাতার 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে এক প্রতিষ্ঠানে তল্লাশী করতে যায়। তল্লাশীর সময় অমর চ্যাটার্জী পলাতক হন এবং এক সঙ্গী রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হন। পলাতক অমর চ্যাটার্জী এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে প্রায় দুই মাস আশ্রয় দিয়ে রাখলেন ননীবালা দেবী রিষড়াতে। এদিকে গ্রেপ্তারের সময় রামচন্দ্র মজুমদার একটা 'মাউজার' (Mauser) পিস্তল কোথায় রেখে গেছেন সে-কথা জানিয়ে যেতে পারেননি। অতএব বিধবা ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে জেলে ঢুকে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে পিস্তলের খোঁজ আনতে যান। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পিস্তলের সন্ধান জেনে বেড়িয়ে এলেন প্রেসিডেন্সি জেল থেকে। পুলিশের নজর এড়াতে ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

চন্দননগরে আবার বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তবে রিষড়ার মতো এখানেও মেয়েরা না থাকলে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত না। তখন আবার এলেন ননীবালা দেবী, গৃহকর্ত্রীর বেশে। কিন্তু পুলিশের কাছে খবর পৌঁছায় এবং তারা তৎপর হয়ে উঠেছিল ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে। ননীবালা দেবী পালিয়ে পেশোয়ার গেলেন। প্রায় ষোলো- সতের দিন পরে পুলিস সন্ধান পেয়ে যখন ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করেন। জেলে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করেও পুলিশ কোন খবর পায়নি তাঁর কাছে।

জেল থেকে ফিরে এসে বালিতে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে তিনি ঠাই পেলেন না। প্রথমত সকলেই পুলিসকে ভয় পায়। এছাড়া বিধবা হয়েও পরস্ত্রী সাজা, পরপুরুষের সাথে একঘরে থাকা বা পেশোয়ার যাওয়া এইসব কারনে সমাজের এক পক্ষ মেনে নেয়নি। অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব বিপ্লবী সংগঠন বা চেনাশোনা সবটাই ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচারে শেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় তখন উত্তর কলকাতার এক বস্তিতে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়। সুতো কেটে, রান্নার কাজ করে কোনমতে আধপেটা খেয়ে তাঁর দিন কাটতে থাকে। যিনি সমাজকে উপেক্ষা করে দেশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, ইতিহাস তাঁর আত্মত্যাগ মনে রাখার প্রয়োজনবোধ করেনি। কেউ মনে রাখেনি যাঁদের আত্মত্যাগের কথা তাঁদের দলেই ছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দী ননীবালা দেবী।

**‘We should have but one desire today - the desire to die so that India may live - the desire to face a martyr's death, so that the path to freedom may be paved with the martyr's blood.’**

**Netaji Subhas Chandra Bose**

# বীরাঙ্গনা ঝলকারী বাঈ

ঝলকারী বাঈ ছোট থেকেই ছিলেন অসীম ক্ষমতার  এবং দৃঢ় চরিত্রের একজন রমণী। তিনি ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের যোগ্য সহকারী ছিলেন। দরিদ্র দলিত পরিবারের মেয়ে হলেও তাঁর বাবা তাঁকে ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র চালানো ইত্যাদি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। ১৮৩০ সালের ২২ শে নভেম্বর ঝাঁসির কাছে ভোজনা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।  তাঁর পিতার নাম ছিল সদবর সিংহ ও মাতা ছিলেন যমুনা দেবী। সেই সময় তিনি বেশি পড়াশোনা না করলেও যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জানা যায় জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে তিনি বাঘের সাথে লড়াই করেছিলেন এবং বাঘকে নিহত করেছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে ঝলকরি বাঈ একদল ডাকাতের বিরুদ্ধে লড়াই করে এক ব্যবসায়ীকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর বীরত্বে খুশি হয়ে গ্রামবাসীরা লক্ষ্মীবাঈয়ের এক বাহাদুর সৈনিকের সাথে তার বিবাহ দেন। একবার গৌরী পূজোর সময় মহারানী কে সম্মান জানানোর জন্য ঝলকারী ভাই রানীর প্রাসাদে গিয়েছিলেন । তখনই লক্ষ্মীবাঈ তাঁর বীরত্বের কথা শুনে তাকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আদেশ দেন ।

লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি অনুসারে ঝাঁসি ইংরেজরা দখল করলে লক্ষ্মীবাঈ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ইংরেজরা লক্ষ্মীবাঈ এর দুর্গ আক্রমণ করলে রানীকে রক্ষা করার জন্য ঝলকারী বাঈ রানীর সাজ পোশাক পরে কিছু সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান। এই সুযোগে লক্ষ্মীবাঈ তাঁর শিশু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ঝাঁসি ত্যাগ করেন। ঝলকারী বাঈয়ের স্বামী রাজপ্রাসাদ রক্ষা করতে গিয়ে ইংরেজদের হাতে শহীদ হন। অনেকেই মনে করেন ঝলকারী বাঈ যুদ্ধ করতে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং সেই আঘাতেই তার মৃত্যু হয় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। এই নারীর কথা ইতিহাস পাতায় অবহেলিত ছিল দীর্ঘসময়। ভারত সরকার ২০০১ সালে ২২ শে জুলাই তাঁকে স্মরণ করে ডাক টিকিট প্রকাশ করে। ঝাঁসির দুর্গের একটি মিউজিয়ামকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ তাঁর নামে উৎসর্গ করে। এমন বীর নারীর জন্য অন্তরের গোপন শ্রদ্ধা রইল।

**"We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far." ~ Swami Vivekananda**

# স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী বাসন্তী দেবী

**অন্বেষা চ্যাটার্জ্জী**

**দ্বিতীয় সেমিস্টার**

বাসন্তী দেবী ১৮৮০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক দেশ হল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার মধ্যে নাওগাও গ্রামে। তিনি পিতা বরদানাথ হালদার ও মাতা হরসুন্দরী দেবীর সঙ্গে ছোটোবেলায় আসামে থাকতেন। বাসন্তী দেবীর পিতা বরদানাথ হালদার আসামের বৈজ্ঞনী স্টেট এর দেওয়ান ছিলেন। বাসন্তী দেবীর বিবাহ হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর মাসে, ২২ বছরের যুবক চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে। তাঁর শ্বশুরবাড়ির ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যে তেলিরবাগ গ্রামে । তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলেই ছিল উচ্চ শিক্ষিত। তিনি তিনার স্বামী চিত্তরঞ্জন এর কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শুধু লেখাপড়া নয় রাজনৈতিক শিক্ষাও তিনি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তিনার স্বামীর কর্মজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

১৯২০ সালে যখন দেশবন্ধু নাগপুর কংগ্রেসে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তাঁর ব্যারিস্টারী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান করবেন। তখন সকলে স্তম্ভিত হন এবং বলেন যে মাসিক অন্তত ৫০০০০ টাকার এই আয় ছেড়ে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া তার উচিত নয়। সবাই মিলে যখন দেশ বন্ধুকে বাধা দিতে লাগলেন তখন বাসন্তী দেবী আর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাকে বলেছিলেন "অর্থকে পৃথিবীর বড় সম্পদ বলে আমি মনে করি না। তোমার এই সংকল্পে আমিও তোমার পাশে রয়েছি।" সেদিন যদি বাসন্তী দেবী সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর স্বামীর পাশে এসে না দাঁড়াতেন এবং এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ না দিতেন তবে আজ দেশবন্ধু কি "দেশবন্ধু" হতে পারতেন কিনা কে জানে। এরপর 1921 সালে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন সেই সময় বাংলার মেয়েরা এই আন্দোলনে যোগদান করেননি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী কে বলেন তাঁদের চরকার প্রচলনের কাজ করতে হবে এবং মেয়েদের সাহস দিয়ে কাজে নামাতে হবে। এই সময় মেয়েরা বাড়ির বাইরে বের হতো না আর রাজনৈতিক কাজ করা তো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এই কঠিন দায়িত্বের ভার পড়লো বাসন্তী দেবীর উপর। ৬ই ডিসেম্বর দেশ বন্ধুর পুত্র চির রঞ্জন যখন বউবাজার এবং কলেজ স্কোয়ারে একদল স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে হরতাল ঘোষণা করেন তখন তিনিসহ আরও ২১ জনকে পুলিশের গ্রেফতার করেন।

বাসন্তীদেবী যখন জেলে তার পুত্রের সাথে দেখা করতে গেলেন তিনি পুত্রের পিঠে অত্যাচারের চিহ্ন, সার্জেন্টের  বুলেটের দাগ দেখে বিচলিত ও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। চিররঞ্জন এর ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়েছিল। তারপরের দিনই ৭ ডিসেম্বর বাসন্তী দেবী বেরিয়ে পড়লেন আইন আমান্ত ও হরতাল ঘোষণা করতে খাদি ঘাড়ে নিয়ে বড়বাজার। তার সঙ্গে গেলেন তাঁর ননদ, দেশ বন্ধুর সহোদরা উর্মিলা দেবী এবং নারী-কর্মমন্দিরের একজন কর্মী স্থনীতি দেবী। তারা হরতাল ঘোষণা করবার পরই তাদের তিনজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাসন্তী দেবীরা যখন গ্রেফতার হয়েছিলেন তখন থানার সামনে জনতার ভিড় দেখা গিয়েছিল। বাসন্তী দেবী গান্ধীজীর ছেলে হীরালাল কে ডেকে জনতাদের সরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন । সেই অনুরোধ শুনে জন তারা পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।  পুলিশ যখন তাদের লালবাজারে নিয়ে গেল মুছলেখা জন্য তখন তারা মুছলেখা দিতে অস্বীকার করেছিল। তারপর রাত 7 টা নাগাদ তাদের নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সি জেলে। তারা সেখানে জামিন এ মুক্তি পেতে অস্বীকার করল। ওদিকে বিরাট জনতা বড়বাজারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং বললো "আমরাও জেলে যাব"। দলে দলে যুবকেরা গ্রেপ্তার হতে লাগলেন। সেই রাতে গভারমেন্ট প্রায় রাত এগারোটা নাগাদ বাসন্তী দেবীদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার এর পরই আগুন জ্বলে ওঠে সারা বাংলাতে। তরুণরা উত্তেজিত হয়ে দলে দলে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মেয়েরাও সাড়া দিলেন। সেদিন বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের যে প্রভাব বাংলা দেখেছিল তার বর্ণনা হয় না। জাতির সে এক বিরাট জাগরণ। বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তারের তিনদিন পর ই ১০ ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় দেশবন্ধুকে। দেশ বন্ধুর গ্রেপ্তারের পর "বাডালার কথা" পত্রিকা বাসন্তী দেবীকে সম্পাদনা করতে হয়।। ১৯২২ সালে এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামের সে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি সভানেত্রীত্ব করেন এবং দেশবন্ধুর নতুন কর্ম পন্থার ইঙ্গিত দেন। দেশবন্ধু যতদিন জীবিত ছিল তাঁর সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক কাজে বাসন্তী দেবী ও অতপ্রতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ১৯২৫ সালে ১৬ই জুন দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু হয় । তারই এক বছর পরে ১৯২৬ সালের ২৬ শে জুন তাঁর একমাত্র পুত্র চিত্তরঞ্জন এর মৃত্যু হয়। এই বিপর্যয়ের পর বাসন্তী দেবী নিজেকে সকলের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত হয়েছিল।

HAZI A.K. KHAN COLLEGE
DEPARTMENT OF HISTORY
MEMORY BOOK
SESSION - 2021-2022
HAZI A.K. KHAN COLLEGE
Harinarpara, Murshidabad, West Bengal, Pin- 742166
1st Lecture
DEPARTMENTAL LECTURE SERIES
ON
Gender Equality in India
Jointly Organized by
Department of Philosophy
&
Department of History
Hariharpara, West Bengal, India
2CV8+C7V, Hariharpara, West Bengal 742166, India
Lat 24.04382°
Long 88.415697°
20/04/22 01:11 PM
Google